শতবর্ষে কবি-অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র

মঞ্জুভাষ মিত্র

পৃথিবীতে কোনও কোনও মানুষ যেন কপালে রাজটিকা নিয়ে আসে, তাদের চেহারায় যেমন আচার আচরণেও তেমন একটা রাজকীয় মর্যাদা ও ভঙ্গী প্রকাশ পায়। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রকে যখনই দেখেছি তখনই এই কথাটি মনে হয়েছে। উনি ছিলেন যাকে বলে 'ক্যারিশম্যাটিক', ওঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই ওঁর ব্যক্তিত্বের মোহময় আকর্ষণ অনুভব করেছেন। আমিও নিজেকে ওঁর গুণমুগ্ধ ভক্তদের মধ্যে পরিগণ্য করি।

হরপ্রসাদ মিত্রকে প্রথম আমি জেনেছিলাম কবি হিসেবে পনেরো বছর বয়সে। একটি অসাধারণ জীবন পালটে দেয়ার মত বই আমার হাতে আসে - বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। সেখানে পড়ি ''নিকট বালি, দূর জল'' বলে, একটি কবিতা, ''এসপ্ল্যানেড'' বলে আর একটা কবিতা আমার মনে বেশ ছাপ ফেলেছিল। দুটো পংক্তি মনে আছে -

পথে ওঠা কত ক্লান্তির ক্লেদ
এসপ্ল্যানেড!

মিলের মুন্সিয়ানা সহজেই নজরে পড়ে। কবির নাম হরপ্রসাদ মিত্র। বছর খানেক পরে আরেকটা বই - কবিতার বই - পড়ে ফেললাম, 'প্রেম যুগে যুগে' - সম্পাদক স্বনামধন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র। এখানেও একটা কবিতা 'মণিমালা রায়' যাকে বলে মনের মধ্যে গেঁথে গেল। একটা নিটোল মধুর প্রেমের কবিতা-

দেখিলাম কী নিথর বনছায়া
কাঁপে দূর পাহাড়ের নীচে
দুপুর তো যায়। কে ঘুমায়?
মণিমালা রায়!

সেই নবকৈশোরেও বুঝতে পেরেছিলাম কবিতাটি রচিত হয়েছে 'বনলতা সেনে-র অমোঘ প্রভাবে। বলা বাহুল্য ততদিনে আমার নব আবিষ্কৃত এই 'মডার্ন' ও 'স্মার্ট' কবিকে ভিতরে ভিতরে খুবই ভালোবেসে ফেলেছি।

হরপ্রসাদ মিত্রকে প্রথম চাক্ষুষ দেখি হিন্দু হস্টেলের একতলার ঘরটিতে যেটিকে উনি সকালবেলা অফিস হিসেবে ব্যবহার করতেন। তখন উনি প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নামজাদা অধ্যাপক। আবার হিন্দু হস্টেলের সুপারিনটেনডেনটের দায়িত্বও তাঁর ছিল। তিনি হিন্দু হস্টেলেই সপরিবারে থাকতেন। মধ্য জীবনে উপনীত প্রিয় কবিকে দেখলাম ওই ষাটের দশকের প্রথম দিকে - গৌরবর্ণ সুপুরুষ সুমিষ্ট চেহারা। কথাবার্তায় মনে হল বুদ্ধিদীপ্ত ও ব্যক্তিত্ববান। আমি আজন্ম কলকাতাবাসী লাজুক মুখচোরা ছেলে, একটা দুটোর বেশি কথা বলতে পারিনি। ক্রমে ক্রমে ওঁর ছাত্র হ'লাম। অধ্যাপক হিসেবে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের পরিচয়টা আমার কাছে মনোরম ও হার্দ্য ব'লে প্রতীত হ'ল। এদিকে উনি কিন্তু আমাকে মোটেই চেনেন না, আমি ছিলাম যাকে বলে Self-effasive নেপথ্যচারী - সবার পিছে সবার নীচে থাকতে ভালোবাসতাম।

গোপনে গোপনে কিন্তু আন্দোলিত হতাম স্যারের প্রভাবচ্ছটায়। ছাত্রাবস্থায় ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ' বইটা অন্তত তিনবার আদ্যোপান্ত পড়বার ও দু'বার ওই বই থেকে নোট করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রত্যেকবারই মনে হয়েছিল এ এক আনন্দিত যাত্রা - আমি বুঝতে পারছি কবিতাকে চিনে নেয়ার প্রক্রিয়াগুলো, বুঝতে পারছি সাহিত্য সমালোচনা জিনিসটা ঠিক কি। আসলে এই বইটি ছিল হরপ্রসাদ মিত্রের ডক্টরেটের থিসিস। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন তাই পাণ্ডিত্য বা Scholarship স্বভাবতই রয়েছে, কিন্তু লেখাটা ভালো লেগেছিল আজ বুঝতে পারি তা এক সাহিত্যিকের লেখা বলে। 'রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠ', 'বঙ্কিমসাহিত্যপাঠ' ইত্যাদি অনেক ভালো ভালো criticism বা সমালোচনার বই তিনি লিখেছেন, জীবনানন্দচর্চায় তাঁর নাম সুবিদিত। তাঁর একটা বই, নামটা যতদূর মনে পড়ে 'কবিতার বিচিত্রকথা', বেশ বড় বই- ছাত্রজীবনে ভালো লেগেছিল। বিশেষত সেই বই-এ ''রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের যুগান্ত'' নামক অধ্যায়ে রোমান্টিক কবিতা ও আধুনিক কবিতার পারস্পরিক সম্বন্ধের সুন্দর বিশ্লেষণ আছে। আসলে আধুনিক

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

কবিরা সকলেই প্রচণ্ড রবীন্দ্রভক্ত আবার তাঁরাই কবিতা লেখার সময় নতুন পথ খুঁজছেন। কবি হরপ্রসাদ মিত্র সম্বন্ধেও এই কথাটিই প্রযোজ্য।

হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতা নিয়ে এই প্রসঙ্গে একটা দুটো কথা বলে নিই। হাতের কাছে পাচ্ছি একটা কবিতার বই 'হৃদয়ে চকিত কে সে'। বইটা তিনি আমাকে স্বহস্তে লিখে উপহার দিয়েছেন ১৩৮১ সালে অর্থাৎ ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে। তখন উনি থাকতেন লেকটাউনে। স্ত্রীর অকালমৃত্যু হয়েছে, নিঃসঙ্গ জীবন, সকালের দিকে মাঝে মাঝে ওঁর বাড়ী যেতাম।

'কাব্যের নাম' কবিতাটিতে কবির বেদনাময় চৈতন্য, প্রেম ও শব্দের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় পাচ্ছি–

আমার ঘোলা জলের বালিহাঁস এই শব্দেরা,
আমার রক্তের মধ্যে বালি, – আমার জ্বালা,
বিকালের আলোতে তার গ্রীবাভঙ্গি এখন সর্পিনী।

নিজে ছিলেন চিরযুবা চিরজীবি জীবনরসপিপাসু তার ছাপ নিচের পংক্তিগুলিতে–

আমি রঙ ভালোবাসি
এ কথাই শিমূলের ফুলে।
চৈত্রের দুপুরে তাজা সূর্যমূখী
বিকেলে চামেলি,
ভোরের প্রথম পাখি–
পাতার সবুজে গন্ধরাজ।
(রঙ)

আরেকটি কবিতায় সময়চেতনার ছাপ যা বিংশ শতাব্দীয় কবির অস্তিত্বের সংকটকে ঘড়ির কাঁটার মত অমোঘভাবে অঙ্গুলি দিয়ে দেখায় –

আমরা দুর্ভিক্ষের দুস্তর দিন পেরিয়ে এসেছি,
যুদ্ধের কঠিন সব প্রহরের সাক্ষী আমরা,
জীবনের রক্তাক্ত ক্ষত সকলেই জানি
বিন্দু বিন্দু।

কবিতার নাম ''জেগে থাকি, জেগে থাকো''।

কবির 'আশ্বিনের ফেরিওয়ালা' কাব্যগ্রন্থ তিনি আরো পরে লেখেন। 'সাঁকো থেকে দেখা' তাঁর আর একটি কাব্যের নাম। এম.সি.সরকার প্রকাশনা সংস্থার শ্রী সুপ্রিয় সরকার তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু – মনে আছে একটা সেমিনারের পর তিনি শ্রী সরকারের গাড়ী করে চলে গেলেন। হরপ্রসাদ মিত্রের অধিকাংশ বই-ই এখন ছাপা নেই। স্বয়ং লেখকের মুখে এই নিয়ে আক্ষেপ আমি বেশ কয়েকবার শুনেছি। এম.সি. সরকার যদি তাঁর কিছু কিছু মূল্যবান বই প্রকাশের উদ্যোগ নেন ভালো হয়। আমি একবার স্যারকে প্রশ্ন করেছিলাম – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এত বড় লেখক ছিলেন, অসাধারণ সব উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন – কিন্তু আজকাল আর তাঁকে নিয়ে হইচই হয় না কেন? উনি বললেন, দেখ লেখকের মৃত্যুর পর লোকে তার কথা দ্রুত ভুলে যায়, তার

হরপ্রসাদ মিত্র ছিলেন ভ্রমণবিলাসী মানুষ। মনে আছে একদিন তিনি সকালবেলা রাজস্থান থেকে এলেন, বিকেলবেলা ছুটছেন দক্ষিণভারত সফরে। ওই দক্ষিণ ভারত সফরে গিয়েই তিনি ঝুঁকে পড়লেন ঋষি অরবিন্দের দিকে

বইগুলোর নামও তলিয়ে যায় বিস্মৃতির আঁধারে। কাল বড়ই নির্মম। ভয় হয় লেখক হরপ্রসাদ মিত্রকে বাঙালী ভবিষ্যৎ ভুলে যাবে না তো। কারণটাতো বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নিহিত – বাঙ্গালী বড় আত্মবিস্মৃত জাতি!

দেশ, আনন্দবাজারে এই কবির কবিতা পড়েছি। গোধূলিগনেও তিনি নিয়মিত লিখতেন। একটা ছিমছাম সপ্রতিভতা সবসময় তাঁর কবিতায় ছিল। 'দেশ' না কোথায় একবার তাঁর একটা কবিতা পড়ে চমৎকার লেগেছিল – নাম ছিল সম্ভবত 'ইয়াক' বা ঐ জাতীয় কিছু। হরপ্রসাদ মিত্র কবিতা ও গদ্যের জন্যে যদি লেখক হিসেবে সাহিত্যে একাডেমি পুরস্কার পেতেন ব্যক্তিগতভাবে আমি সুখী হতাম। কারণ আমি মনে করি ওঁর যোগ্যতা ছিল।

হরপ্রসাদ মিত্র যে ছোটোগল্প লিখতেন তা অনেকের অজানা। উনি একবার 'জ্যোতিষবচনার্থ' বলে ওঁর একটা বই আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য বইটা out of print, নাম গল্পটা ও আরো একটা গল্প আমার মনে বেশ ধাক্কা দেয়। প্রথমে 'জ্যোতিষবচনার্থ' গল্পটা বলছি। ...পাড়াগাঁর জমিদারের একমাত্র ছেলে বিলেতে পড়তে গিয়ে মেম বিয়ে করে এনেছে। বাপ জ্যোতিষী দিয়ে একদা ছেলের ভাগ্যগণনা করিয়েছিলেন, নববধূর কারণে বিয়ের এক বছরের মধ্যে পুত্রের মৃত্যু হতে পারে – ফাঁড়া আছে। ফলে বাবা দেশে ফেরার পর বউ–এর জন্য আর ছেলের জন্য দুটি আলাদাঘর নির্দিষ্ট করলেন। এও বলেছিলেন এক বছর তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এক জ্যোৎস্নারাতে ছেলে রাত্রিবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে বিশাল উঠান পাড়ি দিয়ে বিদেশিনী বউ এর ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। হঠাৎ একটা বাঘ আচমকা এসে তাকে মুখে করে নিয়ে যায়। পরদিন একটা ঝোপে আবিষ্কৃত হয় তার অর্ধভুক্ত মৃতদেহ। দ্বিতীয় গল্পটির নাম ভুলে গেছি। এক ভদ্রলোক মাঝে মধ্যে সাঁওতাল পরগণায় তাঁর বাগানবাড়ীতে যেতেন। জমি জুড়ে আমলকী গাছ। অরণ্যবাসে এসে এক কালো দেহাতি মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। মেয়েটি তাঁর বাড়ীতে জলতোলা ঘর

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

ঝাঁট দেয়া ইত্যাদির কাজ করে। খোদ দারোয়ানের মেয়ে অথবা নাতনি। মধ্যরাতে অভিসারের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে। শয়নঘরে একাকী বিনিদ্র রাত জাগছেন বিপত্নীক ক্ষমতাগর্বী পুরুষটি। ঝমর ঝমর মলের শব্দ শোনা গেল। অন্ধকারে উদগ্রীব পায়ে তিনি মধ্যবর্তী দরজা দিয়ে পাশের গোপন ঘরে ছুটে গেলেন। এই হচ্ছে অভিসারের নির্দিষ্ট সংকেতস্থল। তৃষিত বাহু মেলে জড়িয়ে ধরলেন প্রত্যাশিত কৃষ্ণাঙ্গী নায়িকাকে। মুখ থেকে নির্গত হ'ল এক যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ, বুক থেকে গড়িয়ে গেল কয়েক ফোঁটা রক্ত। ভোরবেলা সবাই দেখল একটা শজারুকে আলিঙ্গন করে বাবুমশাই ঘরে পড়ে আছেন। আসলে মাঝরাতে ঘরে এসেছিল মেয়েটি নয়, একটা শজারু – শজারু যখন চলাফেরা করে তখন তার কাঁটাগুলো ঝনঝন করে বাজে ঠিক রূপার মলের মত।

গল্প শুনেছি, হরপ্রসাদ মিত্র প্রথমা পত্নী মন্টুরানীকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর একটা পায়ে অসুবিধা ছিল, বিশেষভাবে তৈরী জুতো পরতে হতো। লেকটাউনের বাড়ীর দেয়ালে তাঁর ছবি দেখেছি, মুখটি সুমিষ্ট। এক কবি-সম্পাদকের স্ত্রীর মুখে শুনেছি মন্টুরানীর মৃত্যু হয়েছিল আকস্মিকভাবে তরকারি কুটতে কুটতে – লেকটাউনের নতুন বাড়িতে। চারপাশে ছড়িয়ে ছিল আধকাটা আনাজপাতি, ঘরনীর মৃত্যু হয়েছিল মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে। অনেক বছর উনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। পরে স্মৃতিভারে ভরা লেকটাউনের বাড়ী বিক্রি করে গলফগ্রীনে শেষপর্যন্ত থিতু হন। ওঁর পরবর্তী জীবনসঙ্গিনী ডঃ নমিতা মিত্র – তিনিও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ লেকটাউনে স্যারের বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম। তখনকার কথা কিছু বলি। একদিন দোতলা না তেতলার ঘরে বসেছি। অধ্যাপক এম.এ-র খাতা দেখছেন। আমাকে দেখে বললেন – খাতাগুলির নম্বর ঠিকমত যোগ করেছি কিনা মিলিয়ে দ্যাখো। Half-Paper প্রত্যেকটা খাতা দেখতে মিনিট পাঁচেক লাগছে। একটা মেয়েকে ৩২ দিলেন ৫০এ, প্রথম শ্রেণী। খাতার উপরে লেখা শ্রী শ্রী আদ্যামা। ঠাট্টা করলাম, স্যার কি আদ্যামা দেখেই প্রথম শ্রেণী দিলেন। ইতিমধ্যে রাঁধুনী এসে ভাজা 'বেগুনী' দিয়ে গেছে, আমরা খাচ্ছি। আর একদিন গিয়ে দেখি স্যার একটা টেপ রেকর্ডার কিনেছেন – আমার দিকে মাউথপিসটা এগিয়ে দিয়ে বললেন একটা নিজের লেখা কবিতা পড়। আমি মন থেকে একটা স্বরচিত কবিতা পড়লাম। সেই আমার প্রথম নিজের রেকর্ড করা গলা নিজে শোনা।

উনি যে কত মহৎ বুঝেছি দু একটা ছোটো ঘটনা থেকে। বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর পর 'কালি ও কলম একটি অবিস্মরণীয় সংখ্যা বার করে। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং হরপ্রসাদ মিত্র। আমাকে বললেন, একটি কবিতা দাও। কবিতা দিলাম। একমাস পরে হঠাৎ এক ছাত্রকে আমার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন সকালবেলা। সঙ্গে চিঠি। দেয়া কবিতার একটা copy এখনই চাই। আদেশ পালন করলাম। বুঝতে পারলাম স্যার কত জেদী ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। নতুন লিখছি – প্রেসে কবিতা হারিয়ে যাওয়াটা কে জানে নেপথ্যে কারো ইচ্ছাকৃত কি না!

হরপ্রসাদ মিত্র ছিলেন ভ্রমণবিলাসী মানুষ। মনে আছে একদিন তিনি সকালবেলা রাজস্থান থেকে এলেন, বিকেলবেলা ছুটছেন দক্ষিণভারত সফরে। ওই দক্ষিণ ভারত সফরে গিয়েই তিনি ঝুঁকে পড়লেন ঋষি অরবিন্দের দিকে। জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর এই এক আশ্চর্য conversion বা রূপান্তর। আমি বললাম – স্যার, আমি তো আপনাকে atheist বা নাস্তিক বলেই জানতাম। উনি হাসলেন। আমাকে উপহার দিলেন পণ্ডিচেরীর emblem বা চিহ্নপ্রতীক পদ্ম আঁকা একটি ছোটো গোল মানিব্যাগ। ১৯৭৫এ তখন আমি সদ্য ঝাড়গ্রাম সরকারী কলেজে অধ্যাপক হয়েছি।

দেখেছি লেকটাউনের বাড়ীতে সকালে ওঁর কাছে নানা ধরনের জনসমাগম হতো। প্রথম প্রথম আমাকেও পাঁচ মিনিট পরে বলতেন – আচ্ছা এখন এসো, ভাই। পরে কিন্তু ঠাঁই দিয়েছিলেন অন্তরে। বসে থাকতাম যতক্ষণ খুশী। কিন্তু সতর্ক থাকতাম, অকারণে ওঁর সময় যেন নষ্ট না করি।

গলফগ্রীনে যে বাড়ীর একতলাতে উনি থাকতেন তার দ্বিতলে আত্মীয়তাসূত্রে আমি মাঝেমধ্যে যেতাম। গেলেই ওঁর কাছে আসতাম। ওঁকে একটু বিষণ্ণ মনে হোত, উনি যেন মনে মনে বলতে চাইতেন–

ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা
(রবীন্দ্রনাথ)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হার্টস্ট্রোক হওয়ায় উনি বুকে পেসমেকার ব্যবহার করতেন।

আমি কলেজ স্ট্রীটে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে একটা পুরোনো বই এর দোকানে স্যারের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ' বইটা হঠাৎ দেখতে পাই ও সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেলি। বলা বাহুল্য বইটা ছিল out of print, দুষ্প্রাপ্য। উনি শুনে খুব খুশী হন। ইচ্ছে ছিল ওঁকে দিয়ে sign বা সাক্ষর করিয়ে নেব। কিন্তু শিক্ষাগুরুর অকাল তিরোধানে ইচ্ছেটা মেটাতে পারি নি।

মৃত্যুর মাত্র একমাস আগে হঠাৎ ওঁর ফোন পেলাম। আমার লেখা একটা কবিতার ভীষণ প্রশংসা করলেন। প্রশংসা করলেন আমার গদ্যেরও। চোখে জল এসে গেল। মনে পড়ল আমি নিজে যখন অধ্যাপক হয়েছি ওঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'' অধ্যাপকরূপে বিচরণ করতে দেখেছি। সে বড় আভিজাত্যময় অবস্থান! এখানে আমি 'কল্লোল যুগ' বইটি থেকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটা মন্তব্য তুলে দিচ্ছি – অচিন্ত্যকুমার বলেছেন মাঝে মাঝে শ্রীরামপুর থেকে আসতেন এক রূপবান যুবা – তিনিই হরপ্রসাদ মিত্র।

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের বাল্যবয়স দেওঘরে কিছুটা কেটেছে। বাবার ছিল

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

বদলীর চাকরী, তিনি ছিলেন ষ্টেশনমাস্টার। অধ্যাপক নিজে আমাকে বলেছেন, দেওঘরে ওঁদের বাগানে ছিল আদরের ছোট বোনের সমাধি। তাঁর বিখ্যাত সহপাঠী হচ্ছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। অধ্যাপক হয়ে প্রথম মাইনে পান ৬০ টাকা, রবীন্দ্র অধ্যাপক হিসেবে মাইনে পেতেন ১৫০০ টাকা। আমার কাছে আক্ষেপ করেছিলেন, তোমরা এখন কত বেশী মাইনে পাও।

আমার মনে হয় জীবনে ওঁকে কিছু কিছু বেদনা-বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রতিভাবান সব মানুষেরই এই নিয়তি, নকশালপন্থী আন্দোলনের সময় যখন ওঁর স্ত্রী অসুস্থ, হস্টেলে ছাত্ররা আলো নিভিয়ে ওঁকে ঘরবন্দী করে রেখেছিল- নানা প্রতিকূল Slogan দিয়েছিল বা ধ্বনি তুলেছিল। এম.এ. ক্লাসে পড়ানোর সময় একটি মর্মস্পর্শী ভাষণে নিজের অন্তরবেদনা প্রকাশ করেছিলেন, ক্লাসরুমে আমি ছিলাম। পড়াতেন 'কালান্তর', দাঁড়িয়ে স্পষ্ট কাটা কাটা উচ্চারণে।

পরিশেষে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে আমাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করে দিচ্ছি - স্বহস্তে টাইপ করে নিজের নাম ঠিকানা এবং আমার নাম ঠিকানা (এমন কি ডিগ্রি পর্যন্ত!) লিখেছেন। চিঠিতে লিখছেন - তারিখ ৮ই মে, ১৯৯৪, বৈশাখ ১৪০১।

স্নেহাস্পদেষু,

মঞ্জুভাষ, এই রবীন্দ্র জন্মমাসে তোমাকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জীবন সম্বন্ধে কোনো শেষ কথা নেই। নিজেকে প্রত্যেক জাগ্রত মুহূর্তেই আবিষ্কার করার সুযোগ ও সম্ভাবনা থেকে যায়। শিক্ষার অশেষ সম্ভাবনা ঘটছেই তো। অন্তরে আগ্রহী থেকেও ইহজীবনে নিশ্চয়তার অভাবে ইহজীবনের সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারিনি বলে দুঃখ হয়।

শুভার্থী
হরপ্রসাদ মিত্র

কয়েকবছর পরে ডিসেম্বরের গোড়ায় লেকটাউনে একটা কাজে সকালবেলা গিয়েছিলাম। সত্তর দশকের প্রথমার্ধে শীতকালে লেকটাউন ছিল ফুলে ফুলে ভরা - সেই প্রিয় ব্যক্তিগত মিথপ্রতিমা 'লেকনগরী'তে আমার ছিল আসাযাওয়া, আজো দেখি সব কিছু ঠিক তেমনি আছে। ভীষণভাবে মনে পড়ে গেল প্রিয় অধ্যাপক, আমার জীবনপথের অন্যতম দিশারী প্রিয় কবি ও গদ্যলেখক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের কথা। পায়ে পায়ে কখন অজান্তে তাঁরই বাড়ীটার সামনে বুঝি এসে পড়েছি। মনে পড়ে গেল জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তাঁকে role model বা অনুকরণযোগ্য আদর্শ করেছিলাম। পুনশ্চ মনে মনে উচ্চারণ করলাম ''তুমি আছো অন্তরে''।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073